প্রথম আলো

কলাম

মতামত

বিশ্ববিদ্যালয়ে আসনসংখ্যা বাড়ানোর উপায় কী

তারিক মনজুর

প্রকাশ: ১৩ নভেম্বর ২০২৪, ১৫: ৫৩

প্রথম কথা, উচ্চশিক্ষা সবার জন্য নয়। বিশেষত, দেশে উচ্চশিক্ষিত বেকারের হার যেখানে আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে। তবে রাষ্ট্র বেকারত্বের কথা বলে দায় এড়াতে পারে না। নতুন নতুন কর্মের সংস্থান যেমন রাষ্ট্রকে করতে হবে, তেমনি আগ্রহী সবার জন্য উচ্চশিক্ষার সুযোগও রাখতে হবে। বর্তমান পরিকাঠামোয় কীভাবে তা সম্ভব, সেই আলোচনা জরুরি।

এ বছর এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ১১টি শিক্ষা বোর্ডে পরীক্ষার্থী ছিলেন ১৩ লাখ ৩১ হাজারের ওপরে। পাসের হার ৭৭ দশমিক ৭৮। তার মানে, পাস করেছেন ১০ লাখ ৩৫ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী। ধারণা করা যায়, এর মধ্যে কিছু শিক্ষার্থী আর পড়াশোনায় থাকবেন না। অবশিষ্ট বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার আশা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেবেন। কিন্তু খুব কমসংখ্যক শিক্ষার্থীই তাঁদের কাঙ্ক্ষিত জায়গায় ভর্তি হতে পারবেন।

মেডিকেল, বুয়েট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য এইচএসসির পর থেকেই শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। কোচিং সেন্টারগুলো শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের বোঝানোর চেষ্টা করে, ভর্তি পরীক্ষা মানে উত্তাল সাগর পাড়ি দেওয়া। বাস্তবেও শিক্ষার্থী-অভিভাবকেরা দেখতে পান, প্রতিবছর একটি সিটের বিপরীতে কীভাবে কয়েক গুণ শিক্ষার্থী রীতিমতো লড়াই করতে থাকেন। এই লড়াইয়ে ব্যর্থ অনেক শিক্ষার্থী শিক্ষাজীবনের বাকি অংশে পড়াশোনার আগ্রহই হারিয়ে ফেলেন।

> আগে চিন্তা করতে হবে আদৌ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আমরা আসনসংখ্যা বাড়াতে চাই কি না। আগে চাইতে হবে, তারপর উপায় বা পরিকল্পনার দিকগুলোও আলোচনার মধ্য দিয়ে পরিষ্কার হতে থাকবে

সর্বশেষ ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ইউনিটের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ভর্তি পরীক্ষায় ১ হাজার ৮৫১টি আসনের বিপরীতে আবেদন করেন ১ লাখ ২২ হাজার ৮০ জন। তার মানে, একটি আসনের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ৬৬ জন। গত কয়েক বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসনসংখ্যা বাড়েনি। অধিকাংশ বিভাগেই আসন কমেছে। এর মানে প্রতিযোগিতা দিন দিন বেড়েছে। দেখা যায়, চার-পাঁচ বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যতসংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পেতেন, এখন তার চেয়ে কমসংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পান। স্বায়ত্তশাসিত অন্য তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়েও তুমুল প্রতিযোগিতা করে শিক্ষার্থীকে ভর্তি হতে হয়।

শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয়কেও তার সক্ষমতা যাচাই করতে হয়। অনলাইনে আবেদনপ্রক্রিয়া উন্মুক্ত করার আগে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রতিটি বিভাগের কাছে জানতে চাওয়া হয়, কতজন শিক্ষার্থী তারা ভর্তি নিতে পারবে। বিভাগগুলো বিদ্যমান পরিস্থিতি বিচার করে শিক্ষার্থীর সংখ্যা নির্ধারণ করে। এ ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষে বসার আসনসংখ্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়। যদিও বেশি চাহিদা আছে, এমন বিভাগগুলোয় বসার আসনের চেয়েও বেশিসংখ্যক শিক্ষার্থীকে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন পর্যন্ত ভর্তি-ইচ্ছুক অধিকাংশ শিক্ষার্থীর কাছে প্রধান আগ্রহের জায়গা। এ ছাড়া স্বায়ত্তশাসিত অন্য তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়েও তুমুল প্রতিযোগিতা করে শিক্ষার্থীকে ভর্তি হতে হয়। তবে অবাক করা

ব্যাপার হলো, যে সাধ্য-সাধনা করে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরুর কিছু দিনের মধ্যেই তার সলিলসমাধি ঘটে। ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীর বেশির ভাগকে একাডেমিক পড়াশোনায় মনোযোগী হতে দেখা যায় না।

অবাক করা ব্যাপার হলো, যে সাধ্য-সাধনা করে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরুর কিছুদিনের মধ্যেই তার সলিলসমাধি ঘটে। ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীর বেশির ভাগকে একাডেমিক পড়াশোনায় মনোযোগী হতে দেখা যায় না। এ ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত কিছু পরিবর্তন আনা দরকার, যাতে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস-পরীক্ষায় মনোযোগী হন। এ ক্ষেত্রে হরে-দরে যেভাবেই হোক শিক্ষার্থীকে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পার করতে হবে—এমন নীতি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বের হয়ে আসতে হবে। কেননা, পাবলিক বিশ্ববদ্যালয়গুলোতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিক্ষাব্যয়ের বিপরীতে বিপুল অর্থ ভর্তুকি দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন বাড়ানোর সবচেয়ে ভালো উপায় এক শিফটের বদলে দুই শিফট চালু করা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন বিভাগও দেখা যায়, যেখানে এক শ থেকে দেড় শ শিক্ষার্থী একসঙ্গে বসে ক্লাস করেন। শিক্ষক গণজমায়েতে বক্তৃতাদানের মতো করে লেকচার দিয়ে ক্লাস শেষ করেন। শ্রেণি কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক আলোচনা, দলগত কাজ বা শ্রেণি-উপস্থাপনার যথেষ্ট সুযোগ থাকে না। অথচ স্রেফ দুই শিফটে ক্লাস নিলে পুরো কার্যক্রম আরও বেশি ফলদায়ক করা সম্ভব।

দুই শিফটে ক্লাস নেওয়া গেলে শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যাও বাড়ানো সম্ভব। এ ক্ষেত্রে কিছু বাড়তি সমস্যা তৈরি হতে পারে। যেমন বেশি ক্লাসের জন্য শিক্ষকদের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি হবে। সে জন্য শিক্ষকসংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজন হতে পারে। কিংবা তাঁদের বাড়তি সম্মানী দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হতে পারে। হলের আবাসন, পরিবহনব্যবস্থা, লাইব্রেরির আসন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও চাপ বাড়বে।

কিছু ব্যবস্থা তাৎক্ষণিক নেওয়া সম্ভব। যেমন ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের একটি অংশ এমন হবে, যাঁরা আবেদনের সময়েই ভর্তি ফরমে নিশ্চিত করবেন, তিনি আবাসিক সুবিধা নেবেন না। পরিবহনের জন্য গাড়ির সংখ্যা বা গাড়ির ট্রিপ-সংখ্যা বাড়াতে হবে। লাইব্রেরিতে শিফট-ব্যবস্থা চালু করলে একটানা চেয়ার দখল করে ‘বিসিএস’ পড়ার প্রবণতাও কমবে। তবে নিশ্চিতভাবেই বিভিন্ন অবকাঠামোগত সুবিধা বাড়ানোর প্রয়োজন হবে। কোনো পরিবর্তনই হঠাৎ আনা যাবে না।

শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার অর্ধেক অংশ সম্পূর্ণ অনলাইনভিত্তিক করা যায়। কোভিডের সময়েই এ কাজে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর দক্ষতা তৈরি হয়েছে। দেখা যায়, অনলাইনে এমন সব সুবিধা পাওয়া যায়, যেগুলো প্রত্যক্ষ ক্লাসরুমে প্রায় ক্ষেত্রেই নেওয়া যায় না। যেমন বইয়ের পিডিএফ কপি উপস্থাপন করে দেখানো কিংবা শিক্ষকের নিজের বানানো স্লাইড দেখিয়ে আলোচনা করা অনলাইনে খুবই সহজ।

বর্তমানে বেশির ভাগ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সপ্তাহে পাঁচ দিন ক্লাস হয়। যদি এমন করা যায়, সপ্তাহে দুই দিন হবে সরাসরি ক্লাস আর দুই দিন অনলাইনে ক্লাস, তবে শিক্ষকদের ক্লাসের চাপ কমতে পারে। বাকি এক দিন রাখা যায়

শিক্ষার্থীদের দলগত কাজ, শ্রেণি-উপস্থাপনা, প্রজেক্ট ওয়ার্ক, লাইব্রেরি ওয়ার্ক, অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি এবং ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য।

‘উচ্চশিক্ষিত বেকার’ কমানোর জন্য মাস্টার্স পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের অন্তত অর্ধেকসংখ্যককে গবেষণাকাজে যুক্ত করতে হবে। তাঁদের গবেষণার বিষয় ও ক্ষেত্র নির্ধারণ করতে হবে সমাজের প্রয়োজনকে বিবেচনায় নিয়ে। শিক্ষার্থীদের নানা প্রজেক্টের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও যুক্ত করতে হবে। এভাবে তাঁরা নিজেদের অধিক দক্ষ ও যোগ্য করে তুলতে পারবেন।

মোদ্দাকথা, আগে চিন্তা করতে হবে আদৌ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আমরা আসনসংখ্যা বাড়াতে চাই কি না। আগে চাইতে হবে, এরপর উপায় বা পরিকল্পনার দিকগুলোও আলোচনার মধ্য দিয়ে পরিষ্কার হতে থাকবে।

- **তারিক মনজুর** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান

স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৪ প্রথম আলো